International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-I, July 2014
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

বরাক উপত্যকার হিন্দু-বাঙালির বিয়ের গানে লোকাচার ও পুরাণ প্রসঙ্গ

ড. প্রিয়ব্রত নাথ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এস.এস.কলেজ., হাইলাকান্দি, আসাম

Abstract

The marriage ceremony of the Hindu Bangalees of Barak Valley is observed through long ceremonial rituals. Songs are one of the important parts of this ceremony. These songs are mainly sung by women. The main feature of the songs is that the important rituals are depicted through these songs. Mythological stories and characters constitute another important feature of these songs. This paper aims to discuss the elements and importance of these folk songs in the marriage ceremony of the Hindu Bangalees of Barak Valley.

Key Words: Folk-cult, Barak Valley, Bangalee, Rituals, Mythology

মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিয়ে। এই বিয়েকে কেন্দ্র করে লোকসমাজে অসংখ্য লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার বর্তমান। এই লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য লোকাচার।

বরাক উপত্যকার হিন্দু-বাঙালির বিয়ে অনুষ্ঠান যেমন দীর্ঘ, তেমনি এই বিয়েকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লোকাচারও বেশ বিচিত্র ও প্রাচুর্যে ভরপুর। এই লোকাচারের একটা বিশেষ অঙ্গ হল গান। মঙ্গলাচরণ থেকে ফিরাযাত্রা পর্যন্ত প্রতিটি অনুষ্ঠানের আচারেই গানের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গানগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, বেশিরভাগ গানেই যে আচারটি পালিত হচ্ছে তার স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। আচারগুলো যাতে স্থায়ী রূপ পায় সেকথা ভেবেই সম্ভবত এই আচারগুলোকে সুর, তাল ও ছন্দের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত এধরণের কয়েকটি বিয়ের গানে কীভাবে লোকাচার ফুটে উঠেছে, আলোচ্য প্রতিবেদন তা-ই তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

বিয়ে অনুষ্ঠানের অন্যতম একটি মেয়েলি আচার হচ্ছে পানখিলি। এই আচারে দেখা যায় যে, এয়ো মেয়েরা শীতল পাটিতে বসে পানের ভেতর সুপুরি ঢুকিয়ে পানটিকে তিনভাঁজ করে বাঁশের শলা গিঁথে দেন। এরপর সুতো দিয়ে বেঁধে তাতে সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে সাতটি বা নয়টি খিলি বানিয়ে ধান, দূর্বা, ফুল দিয়ে পুজো করে তা একটি ডালা বা কুলোয় সাজিয়ে রাখা হয়। এবং বিকেলবেলা তা নিয়ে মন্দিরে যাওয়া হয়। যাবার সময় বর বা কনের মা পানের বাটা তার মাথায় নেন। এই আচারটি গানের মাধ্যমে ব্যক্ত হয় এভাবে ---

চল চল এগো সখী চল শীঘ্র করি।
পান লইয়া কৌশল্যা রানি যাইতা দেবের পুরী।।
পানের খিলি তুলিয়া দিলা কৌশল্যা শিরে।
সবে মিলি চলিয়া গেলা দেবতার মন্দিরে।।
ব্রহ্মা বিষ্ণুর দরজায় দিলা পানের খিলি।
মহাদেবকে দিলা পান মহাযত্ন করি।।
তারপরে চলিয়া গেলা ব্রাহ্মণের নগরে।
ভক্তিভাবে দিলা পান সকল দেবতারে।।[১]

সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মনে হয় যে, আচারটির মাধ্যমে বিয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়। পান-সুপুরি আতিথেয়তা, নিমন্ত্রণ ও সংবর্ধনার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই তো এর মাধ্যমে সব দেবতাকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়।

ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পানের প্রতীকী ব্যঞ্জনাও চোখে পড়ে। আকৃতিগত দিক থেকে দেখতে গেলে পান হচ্ছে স্ত্রী চিহ্নের প্রতীক। এছাড়া পানকে তিনভাঁজ করে শলা গিঁথে সিঁদুরের ফোটা দিয়ে যে খিলি বানানো হয় তা স্পষ্টভাবেই স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনের প্রতীকী রূপকে ব্যঞ্জিত করে। এছাড়া সুপুরি হচ্ছে বহুফলনের প্রতীক। পানপাতার বহুফলনকে আবার প্রজনন ধারনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায়। পান আবার কাম উত্তেজক বলে শারীরিক মিলনের আগে পান খাওয়া কামশাস্ত্রসম্মত। এসব যাবতীয় কারণে বিয়ের লোকাচারে পানের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

অধিবাসের রাতে পালিত আদ্যস্নানের আচারে কনের মা জলভরতি ঘট থেকে একটু একটু করে জল কনের মাথায় ঢালেন। এরপর ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে তেল, সিঁদুর, চন্দন দৈ ইত্যাদি একটু একটু করে ছিটিয়ে দেন। এরপর বিশেষভাবে হলুদ মাখা হয়। এটা 'ছিরিতলা' আচার হিসেবে পরিচিত। পুরো আচারটি গানের মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে এভাবে ---

তোরা আয় গো সব নগরী।
সীতাদেবীর ছিরি তুলইন মলয়া সুন্দরী।।
উত্তম কুরুশীর চৌকি বিচিত্র সাজন।
তার উপরে বসাইলা সীতার আসন।।
সোনার বাটায় ধান্য দূর্বা হীরার বাটায় খইয়া।
বারইলা মলয়া রানি খড়্গা হস্তে লইয়া।।
সাতবার আর্ঘন করইন সীতার তুলইন ছিরি।
মস্তক ঘুরাইয়া খঢ় ফালাইন দূর করি।।[২]

হলুদ আসলে প্রাচীনকাল থেকেই বিশেষ একটি রঙ হিসেবে লোকাচারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাছাড়া সূর্যরশ্মির সঙ্গে হলুদের রঙের সাদৃশ্য থাকায় হলুদকে উর্বরতা শক্তির উৎস হিসেবে ভাবা হয়। কারণ আমরা জানি সূর্য হচ্ছে উর্বরতা শক্তির মূল উৎস। একারণেই বর নিজের হাতে বাসীবিয়ের দিন কনেকে হলুদ মাখিয়ে দেয়। অধ্যাপক দুলাল চৌধুরী এপ্রসঙ্গে বলেছেন ---

> "বর্ণের দিক থেকে হলুদের ভিত্তি হল সবুজ। সবুজ প্রাণের তারুণ্যের সঞ্জীবনী শক্তির প্রতীক দ্যোতনা করে। আর হলুদ পূর্ণতা ও শক্তির দ্যোতক। পরিণতি পক্ক শস্যাদির রঙও হরিদ্রাভ। প্রথম রজস্বলা রমণীর রজের রঙও হরিদ্রাভ। বীর্যের বর্ণও হরিদ্রাভ। সম্ভবত বর্ণগত ভাবানুষঙ্গে হরিদ্রাকে নির্বাচন করার অন্তরালে প্রাচীন বাঙালীর এই বর্ণচেতনার মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে বেশি।"[৩]

অন্যদিকে হলুদের ভেষজ গুণ থাকায় হলুদ রোগ প্রতিরোধক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বিয়ের দীর্ঘ অনুষ্ঠানে বর-কনে যাতে কোন অসুস্থতার কবলে না পড়ে সেজন্য হলুদের এত ব্যাপক ব্যবহার। এছাড়া প্রবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, শুভলক্ষণ ইত্যাদি ভাবনাও হলুদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। হলুদকে আবার জাদুশক্তি সম্পন্ন বলেও ভাবা হয়। অন্যদিকে আমরা জানি যে, হলুদের রূপ ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা রয়েছে। বিয়ের মতো একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে বর-কনের উজ্জ্বল রূপ বজায় থাকার জন্য হলুদের ব্যবহার অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এসব নানা কারণে বিয়ের লোকাচারে হলুদের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

লৌকিক শিল্পকলার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে আলপনা। বিয়েতে এর নানারকম ব্যবহার রয়েছে। বিয়েতে মূলত চাঁদ, সূর্য, লতা, পাতা, পদ্মফূল ইত্যাদি আঁকা হয়। এই আলপনা কথা পাই একটি গানে এভাবে ---

আনন্দ সাগরে ভাসে অযোধ্যা ভূবন।
আনন্দেতে আলিপনা দেয় নারীগণ।।
আসিলা কৌশল্যারানি করি আয়োজন।
সুমিত্রা কৈকেয়ী আসি মিলিলা তখন.।।
চিত্রিলা সুন্দর চিত্র মানস মোহন।

নানাজাতি পুষ্পচিত্র লতিকা শোভন।।
বিবিধ বিটপী কত নয়ন রঞ্জন।
পশুপাখি আদি কত না যায় বর্ণন।।[৪]

বিয়েতে সাজগোজের একটা ব্যাপার থাকে। যেমন কনে সাজানো, বর সাজানো, কুঞ্জ সাজানো, বর-কনের খাট সাজানো, ঝাঁপি সাজানো ইত্যাদি। এই সাজগোজের ব্যাপারটিও ব্যক্ত হয় বিভিন্ন গানে। এরকম একটি ঝাঁপি সাজানোর গান হচ্ছে ---

চল গো সখী নদীয়াপুরী,
ঝাঁপি সাজায় শচীরানি,
সাজায় ঝাঁপি পরম যতনে,
তোরা দেখ গো।
হরিতাল মিশাইয়া তাত
পদ্ম আকইন নানান জাত,
চারিকুনায় তুলইন চারি ফুল
তোরা দেখ গো।
আত্তি গুড়া আকইন তাত,
আর আকইন রুহিত মাছ,
আর আকইন রস বৃন্দাবন
তোরা দেখ গো।[৫]

বিয়েতে ঠিক আগে 'দধিমঙ্গল' নামে একটি আচার পালিত হয়। আজকাল এতে পুরোহিত অংশগ্রহণ করলেও আচারটি পুরোপুরি লৌকিক। আচারটিতে বর ও শাশুড়ির মাঝখানে একটি কাপড় ধরা হয়। এই কাপড়ের নিচের দিক দিয়ে বর তার হাত শাশুড়ির দিকে বাড়িয়ে দেয়। শাশুড়ি বরের হাতে ক্রমে জল, দুধ ও দৈ ঢেলে ধুয়ে নেন। এরপর খই, ধান, দূর্বা দিয়ে নিচে থেকে একটু একটু করে মাটি তিনবার বরের হাতে তুলে দেন। এই হাত আবার বরের শ্যালককে মুছে দিতে হয়। এছাড়াও কনের মা তার পায়ের আঙুলে সুতো বেঁধে সেই সূতো বরের উচ্চতা পর্যন্ত নিয়ে সাতবার ঘোরান। দধিমঙ্গলের গানে আমরা আচারটির কথা এভাবে পাই ---

সখী চল যাই চল যাই দধিমঙ্গলে।
বাহির হইলা পাটেশ্বরী,
সখীগণ সঙ্গে করি,
দধির পসার মাথে করি,
থইল দধি ভূমির উপরে।
সাতনাল সুতা দিয়া জামাইরে ঝুকিলা গিয়া,
সাতবার পানের খিলি দিলা লখাইর হস্তে ঢালিয়া।
কইন্যার অ যে ছোটভাই নেতের বস্ত্র আনচাইন,
মুছিয়া তুল লখাইর হস্তের দধি।[৬]

আসলে আগেকার দিনে বর ও শাশুড়ির মধ্যে বয়সের তফাৎ খুব একটা ছিল না। ফলে কোথাও কোথাও তাদের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যেত। এই সম্পর্ক যাতে গড়ে না ওঠে সেজন্য তাদের মধ্যে একটা সম্ভ্রমের সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা হত। আজও অনেক শাশুড়ি তার মেয়ের বরের সামনে ঘোমটা দিয়ে থাকেন। দধিমঙ্গলের আচারে কাপড় দিয়ে আড়াল দেবার ব্যাপারটাও সম্ভবত এই ভাবনা থেকেই এসেছে। এই আচারে কনের মা বরের হাতে ভাল করে দই ঢালেন। দই হচ্ছে পুরুষবীর্যের প্রতীক। সুতরাং আচারটি উর্বরতা-সূচক।

বিয়ের সাতপাক অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে একটি গানে এভাবে ---

হের সবে সহচরী আজি কী আনন্দ হেরি

সাবিত্রীর শুভ পরিণয়।
লইয়া বরর্ণডালা সুকুমারী রাজবালা
সত্যবানে প্রদক্ষিণ করয়।।
শুভক্ষণে সত্যবানে বরে মালা সযতনে
চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি হয়।
স্বর্গে থাকি দেবগণে আশীষিল দুইজনে
প্রাণে প্রাণে মিশে যেন রয়।।
বাজিল দুন্দুভি ধ্বনি মধুর মধুর শুনি
উলুধ্বনি করে নারীচয়।
কিঙ্কর বলে কুতূহলে শুভক্ষণে সুমঙ্গলে
সাঙ্গ হইল শুভ পরিণয়।।[৭]

বাসীবিয়ের সাতপাকে আবার ভিন্ন রকমের। এরও গান রয়েছে। যেমন ---

দেখনা দেখনা আরে দেখ নয়ন ভরিয়া,
অভিমন্যুয়ে সাতপাক দেইন উত্তরারে লইয়া।
চারিগুলি বাঁশের ছিপি চারিদিকে গাড়িয়া,
তারে যে বন্দনা কইলা আওয়া সুতা দিয়া।
কবুলির গোপর দিয়া ভূমির গমিলা,
উত্তম শাইলের গুড়ি দিয়া মশুলি সাজাইলা।
চারিগুলি মঙ্গলঘট চারিস্থানে থইয়া,
আম্রপত্র গঙ্গাজলে ঘাটবন্ধন কইলা।
আওয়া দুধ কুইলপত কলায় সূর্যবন্দন কইলা,
সূর্য অর্ঘ দিয়া সাতপাক আরম্ভিলা।[৮]

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে আচারটি যে পুরোপুরি উর্বরতাসূচক তা সহজেই বোঝা যায়। এখানে বাঁশ বহুফলনের প্রতীক; জলভরা ঘট হচ্ছে গর্ভবতী মেয়ের প্রতীক। জল জীবন, যৌবন ও সৃষ্টির প্রতীক কলা পুরুষ লিঙ্গ ও দুধ পুরুষ বীর্যের প্রতীক। সূর্য হচ্ছে সব ধরনের উর্বরতা শক্তির উৎস। এজন্যই দুধ কলা দিয়ে সূর্য অর্ঘ্য দেওয়া হয়।

বর কনেকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছার পর গাওয়া হয় ---

কী আনন্দ হইল আজি অযোধ্যা নগর।
বধূ লইয়া আইলা রামধন পুরবী ভিতর।।
মুগের পত্রে শাশুড়িয়ে দধিরে রাখিয়া।
বধূর কোমল পদে দধিরে ঢালিলা।।
মাঝঘরে কৌশল্যা রানি শীতল পাটি পাতিলা।
তার উপরে বইছন রামধন সীতা সঙ্গে লইয়া।।
ঘৃতের দশী সামনে রাখি বধূর মুখ দেখিলা।
ধান্য দূর্বা দিয়া পরে আর্ঘন আর্ঘিলা।।[৯]

গানটির মধ্য দিয়ে এসময় পালিত আচারটিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। দই-ইয়ের তাৎপর্য আগেই আলোচিত হয়েছে। ফলে কনের পায়ে দই ঢালার তাৎপর্য সহজেই বোঝা যায়।

চতুর্থমঙ্গলের দিন পালিত পাটিবলা লোকাচার এর কথা পাই আমরা পাটিবলার গানে। যেমন---

চল গো সখী রঙ্গ দেখি দ্বারকাভবন,
রুক্মিণী সহিতে পাটি বলে নারায়ণ।
বামেতে রুক্মিণী দেবী দক্ষিণে শ্রীহরি,
সম্মিলন দুইজন একাসন হেরি।

পাটিগুলি গো হস্তে করি লইয়া,
আসিলা দৈবকী রানি হরষিত হইয়া।
পাটির উপরে দিলা কলা গুয়া পান,
রুক্মিণী সহিতে পাটি বলিতা শ্রীমান।
হরষিতে পাটি বলে রুক্মিণী শ্রীহরি,
চারিদিকে নারীগণে দিলা জয়ের ধ্বনি।[১০]

ঐতিহাসিক তথ্যমতে এ অঞ্চলের জনজীবনে প্রাচীনকাল থেকেই শীতলপাটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। আচারটির বিশ্লেষণে মনে হয় যে, সম্ভবত ঘরের কাজে বর-কনের পারস্পরিক সহযোগিতার রূপক হিসেবে এর উদ্ভব হয়েছে।

বিয়ের লোকাচারগুলো আসলে এমন এক সময় সৃষ্টি হয়েছিল যখন মেয়েরা ছিল আর্থিকভাবে পুরোপুরিভাবে পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল। তাই কনের সার্বিক ভরণপোষণের দায়িত্ব ছিল বরের। পরিবারের সবার সামনে এই ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবার প্রতীকী আচার হচ্ছে এই 'ভাতকাপড়' অনুষ্ঠান। এরও গান রয়েছে ---

কী আনন্দ অযোধ্যাতে,
জানকীরে অন্নবস্ত্র দিতা রঘুনাথে।
স্বর্ণথালে শালির অন্ন পরমান্ন সাথে,
কটরাতে পুঞ্জি পুঞ্জি ব্যঞ্জন থালাতে।
ভাজা বড়া লুচি পুরি অন্নের চারিধারে,
পিষ্টক আদি মিষ্ট দ্রব্য দিলা সারে সারে।
সবে বলে ওরে বাছা শুনহ বচন,
অন্নবস্ত্র দিয়া বধয় করিতায় পালন।[১১]

একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে, বিয়ের দীর্ঘ অনুষ্ঠানে কোন সময়, কী আচার, কীভাবে পালিত হবে তা মনে রাখা খুব কঠিন হলেও, গানের মধ্যে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থাকায় মেয়েরা খুব সহজেই তা পালন করতে পারে। তবে বিভিন্ন কারণে এই লোকাচারগুলো আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এমন একটা সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা যদি বিয়ের গানগুলোকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারি তবে গানের সঙ্গে লোকাচারগুলোও যে স্থায়ী রূপ পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই গানগুলোর আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে মহাকাব্য-পুরাণের অনুষঙ্গ। এরমধ্যে 'রামায়ণ' 'মহাভারত'-ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ধ্রুপদি সাহিত্য ছাড়া লোকপুরাণের অন্তর্গত 'পদ্মাপুরাণ'-এর বেহুলা-লখিন্দর প্রসঙ্গও পাওয়া যায়। বর-কনে রূপে ধ্রুপদি পুরাণের যে চরিত্রগুলো উঠে আসে তার মধ্যে উমা-মহাদেব, রাম-সীতা, অভিমূন্য-উত্তরা, সাবিত্রী-সত্যবান, রুক্মিণী-শ্রীকৃষ্ণই অন্যতম। কোন কোন গানে আবার শ্রীচৈতন্যের প্রসঙ্গও পাওয়া যায়। চরিত্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, কোন চরিত্রই তাদের বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারেনি। অন্যদিকে বিয়ের অন্যতম বিষয় হচ্ছে বর-কনের সুখী দাম্পত্যজীবন কামনার ফলে বিয়ের গানে এই চরিত্রগুলো অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। তবে মনে হয় যে, জনপ্রিয়তম পৌরাণিক চরিত্র হিসেবে নিজের অজান্তেই লোকমানস এই চরিত্রগুলোকে বিয়ের গানে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আবার এদের দাম্পত্য জীবন সুখের না হলেও যেহেতু এরা সমাজে প্রেমের আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তাই হয়ত বিয়ের গানে এদের অন্তর্ভুক্তি। তবে পৌরাণিক অনুষঙ্গ থাকলেওগানগুলো যে লোকমানসের নিজস্ব ঢঙে রচিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিভিন্ন জিনিসের জন্মসম্পর্কিত গানে লোকমানসের এই কল্পনাপ্রবণতা ধরা পড়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে। যেমন : 'গুয়ার জন্ম গান' ---

শুনহ সর্বজন করি নিবেদন,
এগো সখী যেরূপে হইল গুয়ার জন্ম।
করিলেন প্রজাপতি সৃষ্টি যেই কালে,
গুয়ার জনম হইল সুমেরু পর্বতে।

একদিন বাদুড়পাখি কোথা হইতে আইল,
দেখিয়া করি বইল পাখি ছড়ার উপরে,
এমন কঠিন ফল চুষিতে না পারে।
চিনিতে না পারে গুয়া এই কোন ফল,
পাখাত লইয়া সুন্দর মিথিলায় উত্তরিল।
পাখা হইতে সেই গুয়া পড়িল ভূমিতে,
সেই অবধি হইল গুয়ার জন্ম মিথিলাতে।[১২]

একটি পানের জন্মগান হচ্ছে এরকম ---

গন্ধমাদন পর্বত হইতে আনইন হনুমান,
সেই তো পর্বতে ছিল পানের জন্মস্থান।
লঙ্কাপুরীর বিভীষণে সাজাইছে পান বর,
বৃক্ষ রুইয়া আইলা বরের ভিতর।
কৌশল্যায় ডাক দিলা শুন হনুমান,
রামচন্দ্রের উৎসবের শীঘ্র আন পান।
এই কথা শুনি হনু করিলা গমন,
বরের নিকট গিয়া দিলা দরশন।
বর ভাঙ্গিয়া পান আনে হনুমান,
সেই পানে পানখিলি দিলা কৌশল্যায়।[১৩]

শুধু পান-সুপুরিই নয় জাঁতি, চুন, লবঙ্গ, এলাচ ইত্যাদি বিয়ের আচারে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের জন্মসম্পর্কিত গান লোকমানস 'আপন মনের মাধুরি' মিশিয়ে রচনা করেছে। গানগুলোর আঙ্গিক লৌকিক কাহিনি কাল্পনিক, আর অনুষঙ্গ পৌরাণিক। এই পৌরাণিক অনুষঙ্গ বিশেষ করে 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর কাহিনি ও চরিত্রের উপস্থিতি বিয়ের গানগুলোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই বিয়ের গান, যা লোকসঙ্গীতের এক অন্যতম জনপ্রিয় শাখা, তার মধ্যে পৌরাণিক অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকার পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। ইতিহাসবিদ অচ্যুতচরণ চৌধুরী জানিয়েছেন যে, এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা এসেছিলেন মিথিলা থেকে। রাজা আদিধর্মপার বৈদিক যজ্ঞ উপলক্ষে মিথিলা থেকে আসা শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তমই এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ। সুতরাং এ অঞ্চলের লোকমানসে 'রামায়ণ' প্রভাব বিস্তৃত হবার মূলে মিথিলা থেকে আসা এই ব্রাহ্মণদের অবদান থাকতে পারে এমন অনুমান একেবারে অসঙ্গত নয়।

অবশ্য এ অঞ্চলের লোকমানসে 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকার মূলে আর্য সংস্কৃতির প্রভাবও থাকতে পারে। কারণ আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে সবসময় সচেষ্ট ছিল। এবং তারা তাতে সফলও হয়েছিল। তাই তো প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাজারাও ভারতের আর্যবংশীয় রাজাদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এবং এই কাজে তাদের রাজসভার মন্ত্রিরা ও মিথিলা থেকে আসা ব্রাহ্মণরা কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই অঞ্চলেও হয়ত এমন প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। এর প্রমাণ পাই আমরা এই অঞ্চলের প্রধান দুই জনগোষ্ঠী ডিমাসা ও মণিপুরিদের যথাক্রমে ভীম ও হিড়িম্বা এবং অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার বংশধর বলে ভাবার মধ্যে। কেননা এমন কাহিনির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকলেও লোকসমাজে এর প্রচলনের পেছনে একটাই কারণ হতে পারে - তা হচ্ছে, অনার্য জনগোষ্ঠীর আর্য ভাবনার সঙ্গে মিলিত ও একাত্ম হবার প্রেরণা। সে যাই হোক, বরাক উপত্যকার লোকমানসে মহাকাব্য ও পুরাণ যে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় বিয়ের এই গানগুলোর মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, আরও অনেক লুপ্ত তথ্যের সন্ধান দিতে পারে এই গানগুলো। সুতরাং বলা যায়, এই বিয়ের গানগুলো এই অঞ্চলের ইতিহাস চর্চ্চার ক্ষেত্রেও এক অমূল্য সম্পদ।

তথ্যসূত্র :

১। নাথ মিনতি, ভেটলাপার, হাইলাকান্দি, আসাম। সংগ্রহের তারিখ : ০৬-০৭-২০১০
২। 'ঐ'
৩। চৌধুরী দুলাল, 'বাঙালী বিবাহাচার : সংস্কার না বিজ্ঞান', পরিণয় মঙ্গল প্রভাত ঘোষ (সম্পাদিত), নকশি কাঁথা, কলকাতা, ২০১০, পৃঃ ২৯৬
৪। মঙ্গলা নাথ : শিলচর, কাছাড়, আসাম। সংগ্রহের তারিখ : ০৪-০১-২০১১
৫। 'ঐ'
৬। 'ঐ'
৭। 'ঐ'
৮। 'ঐ'
৯। গোস্বামী সুষমা 'ঐ'। উজানগুল, করিমগঞ্জ, আসাম। সংগ্রহের তারিখ : ০১-১১-২০১০
১০। 'ঐ'
১১। 'ঐ'
১২। 'ঐ'
১৩। পাল ঝুমি, ভাঙ্গারপার, কাছাড়, আসাম। সংগ্রহের তারিখ : ০৮-০৭-২০০৯

সহায়ক গ্রন্থ :

সেনগুপ্ত পল্লব, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ'। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১০
চৌধুরী সুজিৎ, 'শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস'। শিলচর : দিনকাল প্রেস লিমিটেড্, ২০০৬
চট্টোপাধ্যায় সৌগত, 'লোকসংস্কৃতি : অন্দরমহল ও বারমহল'। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১০
সোমেশ্বরানন্দ স্বামী, 'ধর্ম কুসংস্কার ও লোকাচার'। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬

পত্র-পত্রিকা:

মিত্র সনৎকুমার (সম্পাদিত)। 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০২ বাংলা
মিত্র সনৎকুমার (সম্পাদিত)। 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা ১১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ, ১৪০৫ বাংলা।